অদৃশ্য ত্রিকোণ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

০১. পুলিস ইন্সপেক্টর রমণীমোহন সান্যাল 2
০২. সুনীল সরকার বোকা বটে, কিন্তু বুদ্ধি আছে 24
০৩. হুকুম সিং-এর ভাই মুকুন্দ সিং 33

০১. পুলিস ইন্সপেক্টর রমণীমোহন সান্যাল

গল্পটি শুনিয়াছিলাম পুলিস ইন্সপেক্টর রমণীমোহন সান্যালের মুখে। ব্যোমকেশ, এবং আমি পশ্চিমের একটি বড় শহরে গিয়াছিলাম গোপনীয় সরকারী কাজে, সেখানে রমণীবাবুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। সরকারী কাজে লাল ফিতার জট ছাড়াইতে বিলম্ব হইতেছিল, তাই আমরাও নিষ্কমার মত ডাকবাংলোতে বসিয়া ছিলাম। রমণীবাবু প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের আস্তানায় আসিতেন, গল্পসল্প হইত। তাঁহার চেহারাটাও ছিল রমণীমোহন গোছের, ভারি মিষ্ট এবং কমনীয়। কিন্তু সেটা তাঁহার ছদ্মবেশ। আসলে তিনি পুলিস বিভাগের একজন অতি চতুর এবং বিচক্ষণ কর্মচারী। তাঁহার বয়স আমাদের চেয়ে কমই ছিল, বছর চল্লিশের বেশি নয়। কিন্তু প্রকৃতিগত সমধর্মিতার জন্য তিনি আসিলে আডা বেশ জমিয়া উঠিত।

আমাদের কাছে তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত যে নিঃস্বার্থ সহৃদয়তা না হইতে পারে একথা অবশ্যই আমাদের মনে উদয় হইয়াছিল; উদ্দেশ্যটা যথাসময়ে প্রকাশ পাইবে এই আশায় প্রতীক্ষ করিতেছিলাম।

তারপর একদিন তিনি আমাদের গল্পটি শুনাইলেন। ঠিক গল্প নয়, একটি খুনের মামলার কয়েকটি ঘটনার পরম্পরা। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে জোড়া দিয়া একটি সুসংবদ্ধ গল্প খাড়া করা যায়।

বিবৃতি শেষ করিয়া রমণীবাবু বলিলেন, ‘ব্যোমকেশবাবু, কে খুন করেছে আমি জানি, কেন খুন করেছে জানি; কিন্তু তবু লোকটাকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে পারছি না। প্রমাণ নেই। একমাত্র উপায় কনফেশান, আসামীকে নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করানো। আপনার মাথায় অনেক ফন্দি-ফিকির আসে, লোকটাকে ফাঁদে ফেলবার একটা মতলব বার করতে পারেন না?

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘ভেবে দেখব।’

গল্পটি আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; বোধ হয় ব্যোমকেশের মনেও রেখাপাত করিয়া থাকিবে। সে-রাত্রে রমণীবাবু প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ বলিল, রমণীবাবু যে মালমসলা দিয়ে গেলেন তা দিয়ে তুমি একটা গল্প লিখতে পার না?

বলিলাম, ‘পারি। মালমসলা ভাল। কেবল চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব জুড়ে দিতে পারলেই গল্প হবে।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘তবে লেখ। কিন্তু একটা শর্ত আছে; গল্প জমাবার অছিলায় ঘটনা বদলাতে পারবে না।’

‘বদলাবার দরকার হবে না।’

গল্প লিখিতে দুদিন লাগিল। লেখা শেষ করিয়া ব্যোমকেশকে দিলাম, সে পড়িয়া বলিল, ‘ঠিকই হয়েছে মনে হচ্ছে। রমণীবাবুকে পড়িয়ে দেখা যাক, তিনি কি বলেন।’

রাত্রে রমণীবাবু আসিলে তাঁহাকে গল্প পড়িতে দিলাম। তিনি পড়িয়া উৎফুল্ল চক্ষে আমার পানে চাহিলেন—‘এই তো! ঘটনার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব বেমালুম জোড় খেয়ে গেছে। কিন্তু—’

গল্পটি নিম্নে দিলাম–

শিবপ্রসাদ সরকার এই শহরে মদের ব্যবসা করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। টাকার প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল, তাই প্রকাণ্ড বাড়ি, দামী মোটর ছাড়াও তিনি প্রচুর টাকা জমা করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে কৃপণ বলিত, তিনি নিজেকে বলিতেন হিসাবী। এই দুই মনোভাবের মধ্যে সীমারেখা অতিশয় সূক্ষ্ম, আমরা তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব না।

কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে একটা ভারসাম্য আছে। শিবপ্রসাদ সরকারের একমাত্র মাতৃহীন পুত্র যখন সাবালক হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল তাহার চরিত্র পিতার ঠিক বিপরীত। সে অকৃপণ এবং বেহিসাবী, টাকার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই; কিন্তু টাকার বিনিময়ে যে সকল বৈধ এবং অবৈধ ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায় তাহার প্রতি গভীর অনুরাগ আছে। সে দুহাতে টাকা উড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিতা শিবপ্রসাদ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে যথেষ্ট অপত্যস্নেহ ছিল। পুত্রের চালচলন লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল হইল না। সুনীল কিছুকাল স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া রহিল, তারপর আবার নিজ মূর্তি ধারণ করল।

বধূর নাম রেবা; সে সুন্দরী হইলেও বুদ্ধিমতী, অন্তত তাহার সংসারবুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উপরন্তু সে শিক্ষিতা এবং কালধর্মে আধুনিকাও বটে। সে স্বামীর স্বৈরাচার অগ্রাহ্য করিয়া একান্তমনে বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হইল। শিবপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিজেই ব্যবসাঘটিত কাজ-কর্ম দেখিতেন; কারণ পুত্র অপদার্থ এবং কর্মচারীদের শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না। রেবা তাঁহার অধিকাংশ কাজের ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল। মোটর চালাইয়া শ্বশুরকে কর্মস্থলে লইয়া যাইত, সেখানে নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিত, তারপর মোটর চালাইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিত। এইভাবে রেবা শিবপ্রসাদের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

তারপর, রেবা ও সুনীলের বিবাহের চার বছর পরে শিবপ্রসাদের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশ পাইল তিনি সমস্ত সম্পত্তি পুত্রবধূর নামে উইল করিয়া গিয়াছেন।

সম্পত্তি হাতে পাইয়া রেবা প্রথমেই মদের দোকানের বারো আনা অংশ বিক্রয় করিয়া দিল, চার আনা হাতে রাখিল। বড় বাড়িটা বিক্রয় করিয়া শহরের নির্জন প্রান্তে একটি সুদৃশ্য ছোট বাড়ি কিনিল, বড় মোটর বদল করিয়া একটি ছোট্ট ফিয়েট গাড়ি লইল।

স্বামীকে বলিল, 'তুমি মাসে তিনশো টাকা হাত-খরচ পাবে। যদি বাজারে ধার করে তার জন্য আমি দায়ী হব না। খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়ে দিয়েছি।'

তারপর তাহারা ছোট বাড়িতে উঠিয়া গিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহদের সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই।

এই গেল গল্পের ভূমিকা।

সুনীলের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বছর, আঁটসাঁট মোটা শরীর, গোল মুখখানা প্যাঁচার মুখের মত থ্যাবড়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে। বস্তুত যাহারা বাপের পয়সা উড়াইয়া ফুর্তি করে, তাহাদের বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিরই জোর বেশি, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সুনীলকেও সকলে অমিতাচারী অপরিণামদর্শী নির্বোধ বলিয়া জানিত।

সুনীল কিন্তু নির্বোধ ছিল না। সদবুদ্ধি না থাক, দুষ্টবুদ্ধি তাহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে যখন দেখিল সম্পত্তি বেহাত হইয়া গিয়াছে তখন সে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিল না, টাকার জন্য হিম্বিতম্বি করিল না, কেমন যেন জবুথবু হইয়া গেল। শিবপ্রসাদ যতদিন জীবিত ছিলেন সুনীলের বাজার-দেনা তিনিই শোধ করিতেন। কিন্তু রেবা খবরের কাগজে ইস্তাহার ছাপিয়া দিয়াছে, এখন বাজারে কেহ তাহাকে ধার দিবে না। দৈনিক দশ টাকায় কত ফুর্তি করা যায়? সুতরাং সুনীল সুবোধ বালকের ন্যায়।

ঘরেই দিন যাপন করিতে লাগিল। হপ্তায় একদিন কি দুইদিন বৈকালে বাহির হইত, বাকি দিনগুলি বাড়িতে রোমাঞ্চকর বিলাতি উপন্যাস পড়িয়া কাটাইত। রেবার সহিত তাহার সম্পর্কটা নিতান্তাই ব্যবহারিক সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল; বাহ্যত এক বাড়িতে থাকার ঘনিষ্ঠতা, অন্তরে দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব। তাঁহাদের শয়নের ব্যবস্থাও পৃথক ঘরে।

রেবা সকালবেলা মোটর চালাইয়া বাহির হয়; মদের ব্যবসায় সে চার-আনা অংশীদার, প্রত্যহ নিজে হিসোব পরীক্ষা করে; সেখান হইতে দুপুরবেলা ফিরিয়া আসে। অপরাহ্নে আবার বাহির হয়। এবার কিন্তু ব্যবসা নয়; মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র ক্লাব আছে, সেখানে গিয়া গল্পগুজব খেলাধূলা করে, কখনও সিনেমা দেখিতে যায়; তারপর গৃহে ফিরিয়া আসে। সুনীল সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকে।

একটা বুড়ি গোছের ঝি আছে, তাহার নাম আন্না; বাড়ির কাজ, রান্নাবান্না সব সে-ই করে, অন্য চাকর নাই। রেবা সব দিক দিয়া খরচ কমাইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর সুনীল বসিবার ঘরে রহস্য উপন্যাস পড়িতেছিল, রাত্রি আর্টর সময় রেবা ফিরিয়া আসিল। গাড়ি গ্যারাজে বন্ধ করিয়া বেশবাস পরিবর্তন করিয়া একখানা বাংলা বই হাতে লইয়া বসিবার ঘরে একটি সোফায় আসিয়া বসিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও কথা হইল না। নৈশ আহারের বিলম্ব আছে; রেবা বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বইখানার নাম-ব্যোমকেশের কাহিনী।

সুনীলের ভোঁতা মুখ ভাবলেশহীন। সে একবার চোখ তুলিয়া রেবার পানে চাহিল, আবার পুস্তকে চক্ষু ন্যস্ত করিল, তারপর একটু গলা খাঁকারি দিল।

'রেবা—'

রেবা ভ্রূ তুলিয়া চাহিল। সুনীল ইতস্তত করিয়া বলিল, 'তুমি কোন দিন বাড়ির সামনে একটা লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি?'

রেবা বই মুড়িয়া কিছুক্ষণ সুনীলের পানে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'না। কেন?'

সুনীল ধীরে ধীরে বলিল, 'কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি, সন্ধ্যের পর একটা লোক বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে যায়, আবার খানিক পরে তাকাতে তাকাতে ফিরে যায়।'

রেবা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'কি রকম চেহারা লোকটার?'

সুনীল বলিল, 'গুণ্ডার মত চেহারা। কালো মুর্কে জোয়ান, মাথায় পাগড়ি।'

অনেকক্ষণ আর কথা হইল না; তারপর রেবা মনস্থির করিয়া বলিল, 'কাল সকালে তুমি থানায় গিয়ে এত্তেলা দিয়ে এস। নির্জন জায়গা, যদি সত্যিই চোর-ছাঁচড় হয় পুলিসকে জানিয়ে রাখা ভাল।

সুনীল কিছুক্ষণ থতমত হইয়া রহিল, শেষে সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, 'তুমি বাড়ির মালিক, তুমি পুল্লিসে খবর দিলেই ভাল হত না?

রেবা বলিল, কিন্তু আমি তো মুস্কো জোয়ান লোকটাকে দেখিনি।–তা না হয় দু'জনেই যাব।'

পরদিন সকালে তাহারা থানায় গেল; নিজেদের এলাকার ছোট থানায় না গিয়া একেবারে সদর থানায় উপস্থিত হইল। সেখানে বড় দারোগা রমণীবাবু বাঙালী, তাঁহার সহিত সামান্য জানাশোনা আছে।

রমণীবাবু তাঁহাদের খাতির করিয়া বসাইলেন। সুনীলের বাক্যালাপের ভঙ্গীটা একটু মন্থর ও এলোমেলো, তাই রেবাই ঘটনা বিবৃত করিল। এত্তেলা লিখিত হইবার পর রমণীবাবু বলিলেন, 'আপনাদের বাড়িটা একেবারে শহরের এক টেরে। যাহোক, ভয় পাবেন না। আমি ব্যবস্থা করছি, রাত্রে টহলদার পাহারাওলা বাড়ির ওপর নজর রাখবে।'

থানা হইতে রেবা কাজে চলিয়া গেল, সুনীল পদব্রজে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সেদিন বৈকালে রেবা বলিল, 'এ-বেলা আমি বেরুব না, শরীরটা তেমন ভাল ঠেকছে না।'

সুনীল বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, ‘তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।

রেবার মুখে অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল, ‘তুমি বেরুবে। কিন্তু দেরি কোরো না বেশি, সকাল সকাল ফিরে এস; না হয় গাড়িটা নিয়ে যাও—’

সুনীল বলিল, দরকার নেই, হেঁটেই যাব। মাঝে মাঝে হাঁটলে শরীর ভাল থাকে।’

উৎকণ্ঠার মধ্যেও রেবার মন একটু প্রসন্ন হইল। নিজের ছোট্ট গাড়িখানাকে সে ভালবাসে , নিজের হাতে তাহার পরিচর্যা করে; সুনীলের হাতে গাড়ি ছাড়িয়া দিতে তাহার মন সরে না।

সুনীল গায়ে একটা ধূসর রঙের শাল জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। শীতের আরম্ভ , পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

সুনীল শহরের কেন্দ্রস্থিত গলিযুঁজির মধ্যে যখন পৌঁছিল তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। সে একটা জীর্ণ বাড়ির দরজায় টোকা মারিল; একজন মুস্কো জোয়ান লোক বাহির হইয়া আসিল। সুনীল খাটো গলায় বলিল, ‘হুকুম সিং, তোমাকে দরকার আছে।’

হুকুম সিং সেলাম করিল। মুকুন্দ সিং এবং হুকুম সিং দুই ভাই শহরের নামকরা পালোয়ান ও গুণ্ডা; সুনীলের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক দিনের পরিচয়। বড় মানুষের

উচ্ছৃঙ্খল ছেলে এবং গুণ্ডাদের মধ্যে এমন একটি আত্মিক যোগ আছে যে, আপনা হইতেই হৃদ্যতা জমিয়া ওঠে।

সুনীল দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে হুকুম সিংকে কিছু উপদেশ দিল, তারপর তাহার হাতে কয়েকটা নোট গুজিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গলি হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে ধূসর শাল গায়ে লোকটিকে কেহ লক্ষ্য করিল না; লক্ষ্য করলেও সুনীল সরকার বলিয়া চিনিতে পারিত না। এই বস্তিতে সুনীলকে চিনিবে এমন লোক কটাই বা আছে!

সুনীল বাড়ি ফিরিতেই রেবা বলিল, ‘এলে? এত দেরি হল যে!’ সুনীল ফিরিয়া আসায় সে মনে স্বস্তি পাইয়াছে তাহা বেশ বোঝা যায়। রেবার মনে সুনীলের প্রতি তিলমাত্র স্নেহ নাই, স্বামীকে ভালবাসিতেই হইবে এরূপ সংস্কারও নাই; তাহার হৃদয় এখন সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত ও স্বাধীন। কিন্তু মেয়েমানুষ যতাই স্বাধীন হোক, পুরুষের বাহুবলের ভরসা তাহারা ছাড়িতে পারে না।

সুনীল ঘড়ি দেখিয়া বলিল, ‘এখনো এক ঘণ্টা হয়নি। খানিকটা ঘুরে বেড়িয়েছি বৈ তো নয়।

আর কোনও কথা হইল না। চা পান করিয়া দু’জনে বই লইয়া বসিল।

রেবা কিন্তু স্থির হইতে পারিল না। সদর দরজা বন্ধ ছিল, সে মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া জানোলা দিয়া রাস্তার দিকে উঁকি মারিতে লাগিল। রাস্তাটা শহরের দিক হইতে আসিয়া

রেবার বাড়ি অতিক্রম করিয়া কিছুদূর যাইবার পর মোঠ-ময়দান ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। রাস্তার শেষ দীপস্তম্ভটা বাড়ির প্রায় সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ম্রিয়মাণ আলো বিতরণ করিতেছে।

একবার জানালায় উঁকি মারিয়া আসিয়া রেবা সোফায় বসিল, হাতের বইখানা খুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল; তারপর যেন নিরাসক্ত কৌতুহলবশেই প্রশ্ন করিল, 'পুলিসের টহলদার রাত্রে কখন রোঁদ দিতে বেরোয়?'

সুনীল বই হইতে বোকাটে মুখ তুলিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'তা তো জানি না। রাত্রি দশটা এগারোটা হবে বোধ হয়।'

রেবা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিল, আর কিছু বলিল না। দু'জনে নিজ নিজ পাঠে মন দিল। রাত্রি ঠিক আটটার সময় রেবা চমকিয়া মুখ তুলিল। রাস্ত হইতে যেন একটা শব্দ আসিল। রেবা উঠিয়া গিয়া আবার জানালার পদ সরাইয়া উঁকি মারিল। শহরের দিক হইতে একটা লোক আসিতেছে। রাস্তার নিস্তেজ আলোয় তাহাকে অস্পষ্ট দেখা গেল; গাঁটা-গোঁট্টা চেহারা, মাথায় বৃহৎ পাগড়ি মুখের উপর ছায়া ফেলিয়াছে, হাতে লম্বা লাঠি। লোকটা বাড়ির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

রেবা সশব্দে নিশ্বাস টানিল। সুনীল সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল রেবার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে; সে নীরবে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সুনীল উঠিয়া গিয়া রেবার পাশে দাঁড়াইল।

রেবা ফিসফিস করিয়া বলিল, 'বোধ হয়। সেই লোকটা, তুমি যাকে দেখেছিলে।'

সুনীল ঘাড় নাড়িল। দু'জনে পাশাপাশি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আবার নাগরা জুতার আওয়াজ শোনা গেল; লোকটা ফিরিয়া আসিতেছে। রেবা নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল।

লোকটা বাড়ির পানে চাহিতে চাহিতে শহরের দিকে ফিরিয়া গেল। তাহার পদধ্বনি মিলাইয়া যাইবার পর রেবা প্রশ্ন-বিস্ফারিত চক্ষে সুনীলের পানে চাহিল। সুনীলের মনে নিগূঢ় সন্তোষ, কিন্তু সে মুখে দ্বিধার ভাব আনিয়া বলিল, 'সেই লোকটাই মনে হচ্ছে।'

দু'জনে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রেবার মুখ শঙ্কাবিশীর্ণ হইয়া রহিল। সুনীল তাহার প্রতি একটা চোরা কটাক্ষ হানিয়া বই খুলিল।

ঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল-খাবার দিবে কি না। অতঃপর দু'জনে খাইতে গেল।

আহার করিতে করিতে সুনীল বলিল, 'বোধ হয় ভয়ের কিছু নেই। পুলিস যখন দেখাশোনা করবে বলেছে—'

প্রত্যুত্তরে রেবার অন্তরের উষ্মা ঝন ঝন শব্দে বাহির হইয়া আসিল, 'পুলিস তো আর সারা রাত্রি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে না, মাঝে মাঝে টহল দিয়ে যাবে। তার ফাঁকে যদি পাঁচটা ডাকাত দোর ভেঙে বাড়িতে ঢোকে, তখন কি করব?'

সুনীল মুখ হেঁট করিয়া আহার করিতে লাগিল, শেষ বলিল, 'বাড়িতে লাঠি-সোঁটা কিছু আছে?'

রেবা গভীর বিরক্তিভরে স্বামীর পানে একবার চাহিল, এই বালকোচিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না। লাঠি-সোঁটা থাকিলেও চালাইবে কে?

রাত্রে রেবা নিজ শয়নকক্ষের দ্বারে উপরে-নীচে ছিটকিনি লোগাইয়া শয়ন করিল। এত সতর্কতার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, রমণীবাবু তাহার বাড়ি পাহারার ভাল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। কিন্তু রেবার মনের অশান্তি দূর হইল না; বিছানায় শুইয়া সে অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল।

শহরের একান্তে বাড়িটা না কিনিলেই হইত...কিন্তু তখন কে জানিত? এখন চোর-ছাঁচড়ের ভয়ে বাড়ি ছাড়িয়া গেলে মান থাকিবে না...স্বামী বিষয়বুদ্ধিহীন অপদার্থ...কি করা যায়? দুটো শক্ত-সমর্থ গোছের চাকর রাখিবে? কিন্তু চাকরের উপর ভরসা কি? যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইয়া উঠিতে পারে। ডাকাতেরা ঘুষ খাওয়াইয়া যদি চাকরদের বশ করে, তাহারাই রাত্রে দ্বার খুলিয়া ডাকাতদের ঘরে ডাকিয়া আনিবে...তার চেয়ে বুড়ি

আন্না ভাল...শয়নঘরের লোহার সিন্দুকে দামী গহনা আছে, কিন্তু আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র নাই।...

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় রেবা উত্তেজিতভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিল।

তাহার শ্বশুরের একটা পিস্তল ছিল। ছয় মাস পূর্বে তিনি যখন মারা যান, তখন পিস্তলটা থানায় জমা দেওয়া হইয়াছিল। সেই পিস্তলটা কি ফেরত পাওয়া যায় না? কাল সকালেই সে থানায় গিয়া রমণীবাবুর সঙ্গে দেখা করিবে। একটা পিস্তল বাড়িতে থাকিলে আর ভয় কি?

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রেবা ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রেবা সুনীলকে লইয়া আবার থানায় চলিল। পথে সুনীলের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে রেবা বলিল, 'বাবার পিস্তলটি থানায় জমা আছে, সেটা ফেরত নিলে ভাল হয় না?' যেন কথাটা সুনীলের মাথায় আসে নাই, এমনিভাবে চোখ বড় করিয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'ভাল হবে।'

থানায় রমণীবাবু প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ তো, একটা দরখাস্ত করে দিন, হয়ে যাবে। কার নামে লাইসেন্স নেবেন?'

এ কথাটা রেবা চিন্তা করে নাই। সে স্ত্রীলোক, পূর্বে কখনও পিস্তল ছেড়ে নাই; আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে তাহার মনে একটা সন্ত্রস্ত শঙ্কার ভাব আছে। কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিতে চায় না, চট্ করিয়া বলিল, 'কেন, এঁর নামে।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'তাই হবে। আপনি এখনি দরখাস্ত করে দিন; আমি একবার আপনাদের বাড়িতে গিয়ে নিয়ম-রক্ষা রকমের তদারক করে আসব। কালই পিস্তল পেয়ে যাবেন।'

রেবা দরখাস্ত লিখিল, সুনীল তাহাতে সহি করিল। রমণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুনীলবাবু, আপনি আগে কখনো বন্দুক-পিস্তল খুঁড়েছেন?'

সুনীল আমতা আমতা ভাবে বলিল, 'এঁ-না-হ্যাঁ—অনেক দিন আগে লুকিয়ে বাবার পিস্তল নিয়ে কয়েকবার ছুঁড়েছিলাম–তখন ছেলেমানুষ ছিলাম-এঁ-

রমণীবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কাজটা বে-আইনী হয়েছিল। যার নামে লাইসেন্স সে ছাড়া আর কারুর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার হুকুম নেই। অবশ্য আতুরে নিয়মো নাস্তি্ , বিপদে পড়লে সকলেই সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।'

সেদিন বৈকালে রমণীবাবু এনকোয়ারি করিতে আসিলেন এবং চা-জলখাবার খাইয়া ঘণ্টাখানেক গল্প করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিল সুনীল হাবাগোবা জড়-প্রকৃতির লোক, রেবা তাহাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে। হাবাগোবা লোকেরা হাতে

টাকা পাইলে উচ্ছৃঙ্খল হয়, সুনীলও তাঁহাই হইয়াছিল, এখন শুধরাইয়া গিয়াছে। সুনীলের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তখনও চেনেন নাই।

পরদিন সুনীল গিয়া থানা হইতে লাইসেন্স ও পিস্তল লইয়া আসিল। বন্দুকের দোকান হইতে এক বাক্স কার্তুজও কিনিয়া আনিল।

দুপুরবেলা রেবা বাড়ি ফিরিলে সুনীল পিস্তল ও কার্তুজের বাক্স তাহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'এই নাও।'

রেবা সশঙ্ক চক্ষে আগ্নেয়ন্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আমি কি করব? তুমি রাখো, দরকার হলে তুমিই তো ব্যবহার করবে।'

সুনীল ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল, সে পিস্তল ও কার্তুজ লইয়া নিজের ঘরে রাখিয়া আসিল।

ইহার দুইদিন পরে পাগড়িধারী দুর্বত্তটাকে আর একবার রাস্তা দিয়া যাইতে দেখা গেল। তারপর তাহার যাতায়াত বন্ধ হইল।

এক হপ্তা নিরুপদ্রবে, কাটিয়া যাইবার পর রেবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ওরা বোধ হয় জানতে পেরেছে বাড়িতে বন্দুক আছে, তাই আশা ছেড়ে দিয়েছে।'

সুনীল বিজ্ঞের মত মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'হুঁ।'

তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, রেবার মন ততাই নিরুদ্বেগ হইতে লাগিল। সংসারে স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিল। রেবা সকালে কাজে বাহির হয়, বিকালে বেড়াইতে যায়। সুনীল বাড়িতে বসিয়া রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ে; কদাচিৎ সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য বাড়ি হইতে বাহির হয়। তাহার বন্ধুবান্ধব নাই; সে কখনও রেলওয়ে স্টেশনে গিয়া বইয়ের স্টল হইতে বই কেনে; কখনও শহরের এঁদোপড়া গলিতে হুকুম সিং-এর সঙ্গে দেখা করে। হুকুম সিং-এর সঙ্গে তাহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

এইভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল, শীত শেষ হইয়া আসিল। রেবার মন হইতে গুণ্ডার সম্ভাবিত আক্রমণের কথা সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে রেবার দু'টি বান্ধবী বাড়িতে আসিয়াছিল; রেবা তাহাদের লইয়া খাওয়াদাওয়া হাসিগল্পে ব্যস্ত ছিল। রেবার বান্ধবীরা বাড়িতে আসিলে সুনীলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলে, চাকরের মর্যাদাও সে তাঁহাদের কাছে পায় না। তাই তাহারা কেহ আসিলে সুনীল নিজের ঘরে বসিয়া থাকে কিংবা বেড়াইতে যায়। আজও সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল, তারপর চুপি চুপি পিছনের দরজা দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইল। অনেক দিন হইতে সে এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সুনীল শহরে গিয়া গলির মধ্যে হুকুম সিং-এর সঙ্গে দেখা করিল। দশ মিনিট ধরিয়া হুকুম সিং তাহার নির্দেশ শুনিয়া শেষে বলিল, 'খবর পেয়েছি বাড়িতে পিস্তল আছে।'

সুনীল পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল, পিস্তল খুলিয়া দেখাইল, তাহার মধ্যে টোটা নাই। বলিল, 'তুমি নির্ভয়ে বাড়িতে ঢুকতে পার।'

হুকুম সিং হাত পাতিয়া বলিল, 'আমার ইনাম?'

সুনীল দুই মাসে ছয়শত টাকা জমাইয়াছিল। তাঁহাই হুকুম সিং-এর হাতে দিয়া বলিল, 'এই নাও। এর বেশি এখন আমার কাছে নেই। তুমি কাজ সেরে ওর গায়ের গয়নাগুলো নিও। তারপর সম্পত্তি যখন আমার হাতে আসবে তুমি দশ হাজার টাকা পাবে। আমি এখন রেলওয়ে স্টেশনে যাচ্ছি, রাত্রি আটটার পর বাড়ি ফিরব।'

হুকুম সিং বলিল, 'বহুৎ খুব।'

'যা যা বলেছি মনে থাকবে?'

'জি। আপনি বে-ফিকির থাকুন, আমি সাজসজ্জা করে এখুনি বেরুচ্ছি।'

হুকুম সিং কালিকুলি মাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণের জন্য নিজের কোটরে প্রবেশ করিল। সুনীল স্টেশনে গেল না, দ্রুতপদে গৃহের পানে ফিরিয়া চলিল।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া সুনীল দেখিল বান্ধবীরা এখনও আছে। সে আশ্বস্ত হইয়া রাস্তার ধারে একটা বড় গাছের পিছনে লুকাইয়া রহিল। সেখানে দাঁড়াইয়া সুইতে পিস্তল বাহির কলি অন্য পকেট কার্টুন ছিল, তাহা পিস্তল ভরিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রেবার বান্ধবীর চলিয়া গেল। রেবা ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রাত্রি সাড়ে সাতটা। রেবা আন্নাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাবু কোথায় রে?'

আন্না বলিল, 'বাবু বেরিয়েছে। সদর দিয়ে তোমার ওনারা এলেন, বাবু খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'ও। আচ্ছা, তুই রান্না চড়াগে যা।'

রেবা উদ্বিগ্ন হইল না। চোর-ডাকাতের ভয় আর তাহার নাই। সে অন্য কথা ভাবিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। এইভাবে যদি জীবন চলিতে থাকে, মন্দ কি?

বাহিরে গাছের আড়ালে সুনীল ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। শহরের দিক হইতে হুকুম সিংকে আসিতে দেখা গেল। সে নিঃশব্দে আসিতেছে, নাগরা জুতার আওয়াজ নাই।

দ্বারের সামনাসামনি আসিয়া সে আগে পিছে তাকাইল, তারপর দ্বারে মৃদু টোকা দিল।

সুনীল আসিয়াছে মনে করিয়া রেবা দ্বার খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া হুকুম সিং ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং দুহাতে রেবার গলা টিপিয়া ধরিল।

একটি অধোচ্চারিত চীৎকার রেবার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, তারপর আর শব্দ নাই। আন্না রান্নাঘর হইতে চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, সবিস্ময়ে বাহিরের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল যখের মত কালো দুদন্তি একটা লোক রেবার গলা টিপিতেছে। আন্না বাঙ্‌নিস্পত্তি করিল না, রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া দ্বারে হুড়কা আঁটিয়া দিল।

হুকুম সিং যখন দেখিল রেবার দেহে প্রাণ নাই তখন সে তাহাকে মেঝোয় শোয়াইয়া দিল; রেবার হাতের কানের গলার গহনাগুলা খুলিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিল, তারপর সদর দরজা দিয়া বাহির হইল।

গাছের আড়ালে সুনীল এই মুহুর্তটির প্রতীক্ষ করিতেছিল। ‘কে? কে? বলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। হুকুম সিং হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়ছিল, সুনীল ছুটিয়া আসিয়া পিস্তল তুলিল, হুকুম সিং-এর বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের সমস্ত কার্তুজ উজাড় করিয়া দিল। হুকুম সিং মুখ থুবড়াইয়া সেইখানেই পড়িল, আর নড়িল না।

সুনীল তখন চীৎকার করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল–’কী হয়েছে! অ্যাঁ-রেবা-?

রান্নাঘরে আন্না সুনীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিল। সুনীল ব্যাকুলস্বরে বলিল, 'আন্না, এ কী হল! রেবা মরে গেছে। গুণ্ডাটা রেবাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু আমিও গুণ্ডাকে মেরেছি!' সে লাফাইয়া উঠিল—'পুলিস! আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

যথাসময়ে স্থানীয় থানা হইতে পুলিস আসিল। আন্না যাহা দেখিয়াছিল পুলিসকে বলিল।

খবর পাইয়া রমণীবাবু আসিলেন। সুনীল হাব্‌লার মত তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, 'আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। ছুটে এসে দেখি ওই লোকটা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। আমার মাথা গোলমাল হয়ে গেল। আমি পিস্তল দিয়ে ওকে মেরেছি। তারপর ঘরে ঢুকে দেখি—' তাহার ব্যায়ত চক্ষু রেবার মৃতদেহের দিকে ফিরিল; সে দুহাতে মুখ ঢাকিল।

রমণীবাবু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি পিস্তল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন?'

সুন্টুসুমখুলি, ঘাড় নাড়িয়া বলি, 'হ্যাঁ। আমার নামে পিস্তল, আমি সর্বদা পিস্তল আমার কাছে রাখি।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'পিস্তল দিন। ওটা আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।'

সুনীল বিনা আপত্তিতে পিস্তল রমণীবাবু হাতে সমর্পণ করিল। পিস্তলে আর তাহার প্রয়োজন ছিল না।

০২. সুনীল সরকার বোকা বটে, কিন্তু বুদ্ধি আছে

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীল সরকার বোকা বটে, কিন্তু বুদ্ধি আছে।'

রমণীবাবু করুণ হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার ধারণা ছিল আমি বুদ্ধিমান, কিন্তু সুনীল সরকার আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। তার মতলব কিছু বুঝতে পারিনি। হুকুম সিংকে খুন করার অপরাধে তাকে যে ধরব সে উপায় নেই। স্পষ্টতই হুকুম সিং তার বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীকে খুন করে গায়ের গয়না কেড়ে নিয়েছিল, সুতরাং তাকে খুন করার অধিকার সুনীলের ছিল। সে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে; পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেছে এবং নিজের দুস্কৃতির একমাত্র শরিককে সরিয়েছে! স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে-ই এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কারণ সেই নিকটতম আত্মীয়। রেবার উইল ছিল না, সুনীল আদালতের হুকুম নিয়ে গদীয়ান হয়ে বসেছে।'

'হুঁ' বলিয়া ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটা রাস্তা বার করুন, ব্যোমকেশবাবু। যখন ভাবি একজন অতি বড় শয়তান আইনকে কলা দেখিয়ে চিরজীবন মজা লুটবে তখন অসহ্য মনে হয়।'

ব্যোমকেশ মুখ তুলিয়া বলিল, 'রেবা অজিতের লেখা বইগুলো ভালবাসতো?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু। ওদের বাড়ি আমি আগাপাস্তলা সার্চ করেছিলাম; আমার কাজে লাগে এমন তথ্য কিছু পাইনি, কিন্তু দেখলাম অজিতবাবুর লেখা আপনার কীর্তিকাহিনী সবগুলিই আছে, সবগুলিতে রেবার নাম লেখা। তা থেকে মনে হয়। রেবা আপনার গল্প পড়তে ভালবাসতো।'

ব্যোমকেশ আবার চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল। আমরা সিগারেট ধরাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। দেখা যাক ব্যোমকেশের মস্তিষ্ক-রূপ গন্ধমাদন হইতে কোন্ বিশল্যকরণী দাবাই বাহির হয়।

দশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। আমরা সাগ্রহে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

সে বলিল, রমণীবাবু, 'রেবার হাতের লেখা যোগাড় করতে পারেন?'

'হাতের লেখা!' রমণীবাবু ভ্রূ তুলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ধরুন, তার হিসেবের খাতা, কিংবা চিঠির ছেড়া টুকরো।...যাতে বাংলা লেখার ছাঁদটা পাওয়া যায়।'

রমণীবাবু গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, 'চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মতলবটা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মতলবটা এই।–রেবা আমার রহস্য-কাহিনী পড়তে ভালবাসতো। সুতরাং অটোগ্রাফের জন্যে আমাকে চিঠি লেখা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মেয়েদের যে ও দুর্বলতা আছে তার পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। মনে করুন। ছ'মাস আগে রেবা আমাকে চিঠি লিখেছিল; আমার অটোগ্রাফ চেয়েছিল, তারপর আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার স্বামী তাকে খুন করবার ফন্দি আঁটিছে, আমি যদি তার অপঘাত মৃত্যুর খবর পাই তাহলে যেন তদন্ত করি।'

রমণীবাবু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'বুঝেছি। জাল চিঠি তৈরি করবেন, তারপর সেই চিঠি সুনীলকে দেখিয়ে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবেন!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করব। সুনীল যদি ভয় পেয়ে সত্য কথা বলে ফেলে তবেই তাকে ধরা যেতে পারে।'

রমণীবাবু বলিলেন, 'আমি রেবার হাতের লেখার নমুনা যোগাড় করব। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'রেবার নাম-ছাপা চিঠির কাগজ ছিল কি?'

'ছিল। তাও পাবেন। আর কিছু?'

'আর-একটা টেপ রেকর্ডিং মেশিন। যদি সুনীল কনফেস করে, তার পাকাপাকি রেকর্ড থাকা ভাল।'

'বেশ। কাল সকালেই আমি আবার আসব।' বলিয়া রমণীবাবু বিশেষ উত্তেজিতভাবে বিদায় লইলেন।

পরদিন সকালে আমরা সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছি, রমণীবাবু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার হাতে একটি চামড়ার স্যাচেল। হাসিয়া বলিলেন, 'যোগাড় করেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'কি কি যোগাড় করলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল খুলিয়া সন্তর্পণে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া আমাদের সামনে ধরিলেন, বলিলেন, 'এই নিন রেবার হাতের লেখা।'

চিঠির কাগজের ছিন্নাংশ, তাহাতে বাংলায় কয়েক ছত্র লেখা আছে—'...স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি কর্তব্য না থাকে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য থাকবে কেন? আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, সেকেলে সংস্কার আঁকড়ে থাকার মানে হয় না...'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'এই রেবার হাতের লেখা! দস্তখত নেই দেখছি। কোথায় পেলেন?'

রমণীবাবু স্যাচেল হইতে এক তা সাদা চিঠির কাগজ লইয়া বলিলেন, 'আর এই নিন রেবার নাম-ছাপা সাদা চিঠির কাগজ। কাল রাত্রে এখান থেকে বেরিয়ে সটান সুনীলের বাড়িতে গিয়েছিলাম; তাকে সোজাসুজি বললাম, তোমার বাড়ি আর একবার খুঁজে দেখব। সে আপত্তি করল না।–কেমন, যা যোগাড় করেছি তাতে চলবে তো?'

ব্যোমকেশ ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল, 'চলবে। রেবার হাতের লেখা নকল করা শক্ত হবে না। যারা রবীন্দ্রীয় ছাঁদের নকল করে তাদের লেখা নকল করা সহজ।–টেপ-রেকর্ডার পেয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'পেয়েছি। যখন বলবেন তখনই এনে হাজির করব।–তাহলে শুভকর্মের দিন স্থির কবে করছেন?'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'আজই হোক না, শুভস্য শীঘ্রম। আমি সুনীলকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা আপনি কারুর হাতে পাঠিয়ে দেবেন।'

একটা সাধারণ প্যাডের কাগজে ব্যোমকেশ চিঠি লিখিল—

শ্রীসুনীল সরকার বরাবরেষু—
আপনার স্ত্রীর সহিত পত্রযোগে আমার পরিচয় হইয়াছিল; তিনি মৎ-সংক্রান্ত কাহিনী পড়িতে ভালবাসিতেন। শুনিলাম তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

আমি কয়েকদিন যাবৎ এখানে আসিয়া ডাকবাংলোতে আছি। আপনি যদি আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাকবাংলোতে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন, আপনার স্ত্রী আমাকে যে শেষ চিঠিখনি লিখিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে দেখাইতে পারি। চিঠিখনি আপনার পক্ষে গুরুত্রপূর্ণ।

নিবেদন ইতি-ব্যোমকেশ বক্সী।

চিঠি খামে ভরিয়া ব্যোমকেশ রমণীবাবুর হাতে দিল। তিনি বলিলেন, ‘আচ্ছা, এখন উঠি। চিঠিখানি এমনভাবে পাঠাব যাতে সুনীল বুঝতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে। দুপুরবেলা টেপ-রেকর্ডার নিয়ে আসছি।’

তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ রেবার চিঠি লইয়া বসিল; নানাভাবে তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে লাগিল; আলোর সামনে তুলিয়া ধরিয়া কাগজ দেখিল, ছিন্ন অংশের কিনারা পর্যবেক্ষণ করিল। তারপর সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

বলিলাম, ‘কি দেখলে?’

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, ‘চিঠিখানা আস্ত ছিল, সম্প্রতি ছেড়া হয়েছে। চিঠির ল্যাজা-মুড়ো কোথায় গেল। তাই ভাবছি।’

আমিও ভাবিলাম। তারপর বলিলাম, ‘রেবা হয়তো নিজের কোন বান্ধবীকে চিঠিখানা লিখেছিল, রমণীবাবু তার কাছ থেকে আদায় করেছেন। বান্ধবী হয়তো নিজের নাম গোপন রাখতে চায়—’

‘হতে পারে, অসম্ভব নয়। রেবার বান্ধবী হয়তো রমণীবাবুকে শর্ত করিয়ে নিয়েছে যে, তার নাম প্রকাশ পাবে না। তাই রমণীবাবু আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন-যাক, এবার জালিয়াতির হাতে-খড়ি হোক। অজিত, কাগজ-কলম দাও।’

অতঃপর দুঘণ্টা ধরিয়া ব্যোমকেশ রেবার হাতের লেখা মক্স করিল। শেষে আসল ও নকল আমাকে দিয়া বলিল, ‘দেখ দেখি কেমন হয়েছে। অবশ্য নাম-দস্তখতটা আন্দাজে করতে হল, একটা নমুনা পেলে ভাল হত। কিন্তু এতেই চলবে বোধ হয়।’

রেবার চিঠি ও ব্যোমকেশের খসড়া পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলাম, লেখার ছাঁদে তফাত নাই; সাধারণ লোকের কাছে ব্যোমকেশের লেখা স্বচ্ছন্দে রেবার লেখা বলিয়া চালানো যায়। বলিলাম, ‘চলবে।’

ব্যোমকেশ তখন সযত্নে চিঠি লিখিতে বসিল। রেবার নাম-ছাপা কাগজে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিল। চিঠি এইরূপ—

মাননীয়েষু,

ব্যোমকেশবাবু, আপনার চিঠি আর অটোগ্রাফ পেয়ে কত আনন্দ হয়েছে বলতে পারি না। আমার মত গুণগ্রাহী পাঠক আপনার অনেক আছে, নিশ্চয় আপনাকে অটোগ্রাফের জন্য বিরক্ত করে। তবু আপনি যে আমাকে দু' ছত্র চিঠিও লিখেছেন সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার অটোগ্রাফ আমি সযত্নে আমার খাতায় গেঁথে রাখলুম।

আপনার সহৃদয়তায় সাহস পেয়ে আমি নিজের কথা কিছু লিখছি। —

আমার স্বামী বিষয়বুদ্ধিহীন এবং মন্দ চরিত্রের লোক, তাই আমার শ্বশুর মৃত্যুকালে তাঁর বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। সম্পত্তি প্রচুর, এবং আমি তাতে আমার স্বামীকে হাত দিতে দিই না। আমার সন্দেহ হয় আমার স্বামী আমাকে খুন করবার মতলব আঁটছেন; বোধ হয় গুণ্ডা লাগিয়েছেন। কি হবে জানি না। কিন্তু আপনি যদি হঠাৎ আমার অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ পান তাহলে দয়া করে একটু খোঁজখবর নেবেন। আপনি সত্যান্বেষী, অসহায়া নারীর মৃত্যুতে কখনই চুপ করে থাকতে পারবেন না।

আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—বিনীত

রেবা সরকার

চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ব্যোমকেশ একটি পুরানো খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিল।

বেলা তিনটার সময় রমণীবাবু আসিলেন, সঙ্গে একজন ছোকরা পুলিস। সে রেডিও মিস্ত্রী; তাহার হাতে টেপ-রেকর্ডারের বাক্স এবং মাইক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি।

রমণীবাবু ব্যোমকেশের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মিস্ত্রীকে বলিলেন, 'বীরেন, তাহলে তুমি লেগে যাও।'

'আজ্ঞে স্যার' বলিয়া বীরেন লাগিয়া গেল।

বসিবার ঘরে টেবিলের মাথায় যে ঝোলানো বৈদ্যুতিক আলোটা ছিল তাহার তারে মাইক লাগানো হইল, টেপ-রেকডার যন্ত্রটা বসানো হইল ব্যোমকেশের শয়ন ঘরে। রেকড়ার চালু হইলে একটু শব্দ হয়, যন্ত্রটা অন্য ঘরে থাকিলে যন্ত্রের শব্দ বসিবার ঘরে শোনা যাইবে না।

সব ঠিকঠাক হইলে বীরেন পাশের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। আমরা বসিবার ঘরে টেবিলের পাশে বসিয়া সহজ গলায় কথাবার্তা বলিলাম; তারপর পাশের ঘরে গেলাম। বীরেন যন্ত্রের ফিতা উল্টাদিকে ঘুরাইয়া আবার চালু করিল, তখন আমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। বেশ স্পষ্ট আওয়াজ, কোনটা কাহার গলা চিনিতে কষ্ট হয় না।

ব্যোমকেশ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'চলবে।–চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'দিয়েছি। আসবে নিশ্চয়। যার মনে পাপ আছে, ও চিঠি পাবার পর তাকে আসতেই হবে। আপনি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চান। কিনা সেটা সে জানতে চাইবে। আচ্ছা, আমরা এখন যাই, আবার সন্ধ্যের পর আসব।'

০৩. হুকুম সিং-এর ভাই মুকুন্দ সিং

ঠিক ছ'টার সময় বীরেনকে লইয়া রমণীবাবু আসিলেন; পুলিসের গাড়ি তাঁহাদের নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রমণীবাবু বলিলেন, 'একটু আগেই এলাম। কি জানি সুনীল যদি সাতটার আগে এসে উপস্থিত হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ করেছেন। প্রথমে আপনারা পাশের ঘরে থাকবেন, যাতে সুনীল জানতে না পারে যে, পুলিসের সঙ্গে আমার যোগ আছে। আমি আর অজিত বসবার ঘরে থাকব; সুনীল আসার পর আপনি তাক বুঝে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

'সে ভাল কথা।' রমণীবাবু বীরেনকে লইয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং দরজা ভেজাইয়া দিলেন। আমরা দু'জনে আসার সাজাইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ক্রমে অন্ধকার হইল। আমি আলো জ্বালিয়া দিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সকালবেলার সংবাদপত্রটা তুলিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। আমি সিগারেট ধরাইলাম। কান দুটা অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া রহিল।

সাতটা বাজিবার কয়েক মিনিট আগেই ডাকবাংলোর সদরে একটি মোটর আসিয়া থামার শব্দ শোনা গেল; আমরা দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। মিনিট দুই-তিন পরে সুনীল সরকার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমণীবাবু যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহার সহিত বিশেষ গরমিল নাই; উপরন্তু লক্ষ্য করিলাম , তাহার বিভক্ত ওষ্ঠ্যাধরের ফাঁকে দাঁতগুলা কুমীরের দাঁতের মত হিংস্র। ভোঁতা মুখে ধারালো দাঁত। সব মিলাইয়া চেহারাটি নয়নরঞ্জন নয়। তার উপর দুশ্চরিত্র। পতিভক্তিতে রেবা হয়তো সীতা-সাবিত্রীর সমতুল্য ছিল না, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুনীল সরকার স্পষ্টতাই রাম কিংবা সত্যবানের সমকক্ষ নয়।

সুনীল বোকার মত কিছুক্ষণ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল , 'ব্যোমকেশবাবু—'

ব্যোমকেশ খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল, ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'সুনীলবাবু? আসুন।'

ন্যালা-ক্যাবলার মত ফ্যালফেলে মুখের ভাব লইয়া সুনীল টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; কে বলিবে তাহার ঘটে গোবর ছাড়া আর কিছু আছে! ব্যোমকেশ শুষ্ক কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনার অভিনয় ভালই হচ্ছে, কিন্তু যতটা অভিনয় করছেন ততটা নির্বোধ আপনি নন। —বসুন।'

সুনীল থাপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সুবর্তুল চক্ষে ব্যোমকেশকে পরিদর্শন করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, 'কী— কী বলছেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। আপনি যখন বোকামির অভিনয় করবেনই তখন ও আলোচনায় লাভ নেই। —সুনীলবাবু, পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে আপনি দুটো মানুষকে খুন করেছেন; এক, আপনার স্ত্রী; দুই, হুকুম সিং। এখানে এসে আমি সব খবর নিয়েছি। আপনি হুকুম সিংকে দিয়ে স্ত্রীকে খুন করিয়েছিলেন, তারপর নিজের হাতে হুকুম সিংকে মেরেছিলেন। হুকুম সিং ছিল আপনার ষড়যন্ত্রের অংশীদার, তাই তাকে সরানো দরকার ছিল; সে বেঁচে থাকলে সারা জীবন ধরে আপনাকে দোহন করত। আপনি এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।'

সুনীল হ্যাঁ করিয়া শুনিতেছিল, হাউমাউ করিয়া উঠিল, 'এ কি বলছেন। আপনি! রেবাকে আমি মেরেছি! এ কি বলছেন! একটা গুণ্ডা-যার নাম হুকুম সিং-সে। আমার স্ত্রীকে গলা টিপে মেরেছিল। আন্না দেখেছে-আন্না নিজের চোখে দেখেছে। হুকুম সিং রেবাকে গলা টিপে মারছে–'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুকুম সিং ভাড়াটে গুণ্ডা, তাকে আপনি টাকা খাইয়েছিলেন।'

'না না, এসব মিথ্যে কথা। রেবাকে আমি খুন করাইনি; সে আমার স্ত্রী, আমি তাকে ভালবাসতাম—'

'আপনি রোবাকে কি রকম ভালবাসতেন, তার প্রমাণ আমার পকেটে আছে—' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেটে আঙুলের টোকা মারিল।

'কী? রেবার চিঠি? দেখি কি চিঠি রেবা আপনাকে লিখেছিল।'

ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া সুনীলের হাতে দিতে দিতে বলিল, 'চিঠি ছিঁড়বেন না। ওর ফটো-স্ট্যাট্ নকল আছে।'

ফুল তাহার সতর্কবাণী শুনিতে পাইল না, চিঠি খুলিয়া দুহাতে ধরিয়া একাগ্রচক্ষে পড়িতে লাগিল।

এই সময় নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রমণীবাবু ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হইল; ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সুনীল যখন চোখ তুলিল তখন প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল রমণীবাবুর উপর। পলকের মধ্যে তাহার মুখ হইতে নিবুদ্ধিতার মুখোস খসিয়া পড়িল। ভোঁতা মুখে। ধারালো দাঁত নিষ্ক্রান্ত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'ও-এই ব্যাপার। পুলিসের ষড়যন্ত্র! আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা।–ব্যোমকেশবাবু, রেবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে জানেন? ঐ রমণী দারোগা।' বলিয়া রমণীবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমরা সুনীলের দিক হইতে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, রমণীবাবু দায়ী! তার মানে?'

সুনীল বলিল, 'মানে বুঝলেন না? রমণী দারোগা রেবার প্রাণের বন্ধু ছিল, যাকে বলে বঁধু। তাই তো আমার ওপর রমণী দারোগার এত আক্রোশ।'

ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। আমি রমণীবাবুর মুখের পানে তাকাইলাম। তিনি একদৃষ্টি সুনীলের পানে চাহিয়া আছেন; মনে হয় তাহার সমস্ত দেহ তপ্ত লোহার মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভয় হইল এখনি বুঝি একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাইবে।

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলিল, 'তাহলে এই কারণেই আপনি স্ত্রীকে খুন করিয়েছেন?'

সুনীল বলিল, 'আমি খুন করাইনি। এই জাল চিঠি দিয়ে আমাকে ধরবেন ভেবেছিলেন ' সুনীল চিঠিখানা মুঠির মধ্যে গোলা পাকাইয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল—'সুনীল সরকারকে ধরা অত সহজ নয়। চললাম। যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে গ্রেপ্তার করুন, তারপর আমি দেখে নেব।',

আমরা নির্বাক বসিয়া রহিলাম, সুনীল ময়াল সাপের মত সর্পিল গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই কয়েক মুহুর্তে সুনীলের চরিত্র যেন চোখের সামনে মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল। সাপের মত খল কপট নৃশংস, হঠাৎ ফণা তুলিয়া ছোবল মারে, আবার গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। সাংঘাতিক মানুষ।

রমণীবাবু একটা অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশ কতকটা নিজমনেই বলিল, 'ধরা গেল না।'

সহসা বাহির হইতে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ আসিল। সকলে চমকিয়া উঠিলাম। সর্বাগ্রে ব্যোমকেশ উঠিয়া দ্বারের পানে চলিল, আমরা তাহার পিছন পিছন চলিলাম।

ডাকবাংলোর সামনে সুনীলের মোটর দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সামনের চাকার পাশে মাটির উপর যে মূর্তিটা পড়িয়া আছে তাহা সুনীলের। তাহার পিঠের উপর হইতে একটা ছুরির মুঠ উঁচু হইয়া আছে।

মৃত্যুযন্ত্রণায় সুনীল কাৎ হইবার চেষ্টা করিল; আমি ও ব্যোমকেশ তাহাকে সাহায্য করিলাম বটে, কিন্তু অন্তিমকালে আমাদের সাহায্য কোনও কাজে আসিল না। সুনীল একবার চোখ মেলিল; আমাদের চিনিতে পারিল কিনা বলা যায় না, কেবল অস্ফুট স্বরে বলিল, 'মুকুন্দ সিং–'

তারপর তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল।

পথের সামনে ও পিছন দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; পথ জনশূন্য। আমার বিবশ মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন ঘুরিতে লাগিল-মুকুন্দ সিং কে? নামটা চেনা-চেনা। তারপর মনে পড়িয়া গেল, হুকুম সিং-এর ভাইয়ের নাম মুকুন্দ সিং। মুকুন্দ সিং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছে।

লাশ চালান দেওয়া এবং আইনঘটিত অন্যান্য কর্তব্য শেষ করিতে সাড়ে নটা বাজিয়া গেল। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। রমণীবাবুও ক্লান্তমুখে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। বীরেন তখনও পাশের ঘরে যন্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, রমণীবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘তুমি যাও, যন্ত্রটা থাক। আমি নিয়ে যাব।’

বীরেন চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনে সিগারেট টানিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, ‘সুনীল আইনকে ফাঁকি দিয়েছিল বটে কিন্তু নিয়তির হাত এড়াতে পারল না। আশ্চর্য! মাঝে মাঝে গুণ্ডারাও অনেক নৈতিক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে।’

রমণীবাবু বলিলেন, ‘একটা সমস্যার সমাধান হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সমস্যা তৈরি হল। এখন মুকুন্দ সিংকে ধরতে হবে। আমার কাজ শেষ হল না, ব্যোমকেশবাবু।’

কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিবার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'সুনীলের অভিযোগ সত্যি–কেমন?'

রমণীবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমার আর রেবার বাড়ি এক শহরে, এক পাড়ায়। ওকে ছেলেবেলা থেকে চিনতাম, কিন্তু ভালবাসা-বাসি ছিল না...তারপর রেবার যখন ওই রাক্ষসটার সঙ্গে বিয়ে হল তখন এই শহরেই ওর সঙ্গে আবার দেখা হল...রেবা মন্দ ছিল না, কিন্তু কি জানি কেমন করে কী হয়ে গেল...সুনীল যে জানতে পেরেছে তা একবারও সন্দেহ হয়নি...সুনীলকে আহাম্মক ভেবেছিলাম, তারপর রেবা যখন মারা গেল তখন বুঝলাম সুনীল কেউটে সাপ...তারপর ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিলাম...শেষে আপনি এলেন, আপনার সাহায্যে শেষ চেষ্টা করলাম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে চিঠির ছেড়া অংশটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন সেটা রেবা আপনাকে লিখেছিল?'

রমণীবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমাদের দেখাশোনা বেশি হত না। রেবা আমাকে চিঠি লিখত, মনের-প্রাণের কথা লিখত। অনেক চিঠি লিখেছিল।–কিন্তু রেবার কথা আর নয়, ব্যোমকেশবাবু। এখন বলুন টেপ-রেকর্ডের কী হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি আর হবে, ওটা মুছে ফেলা যাক। —আসুন।'

পাশের ঘরে গিয়া আমরা রেকর্ডার চালাইলাম। সদ্যমৃত সুনীলের জীবন্ত কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তারপর ফিতা মুছিয়া ফেলা হইল।